# সমাজ-সংস্কার ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবের অবদান

অমলেন্দু চক্রবর্তী

উত্তর-পূর্ব ভারতবর্ষে শংকরদেবের আবির্ভাব একটি যুগান্তকারী ঘটনা। বস্তুত ভারতবর্ষের এই পূর্বপ্রান্তে শংকরদেব আমাদের জাতীয় জীবনকে আধুনিকতার পথে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে এখানে উপস্থাপিত করতে পারি। "From a land of primitive Animism which was being affiliated to Saivism and the Saktism of the Tantras, Sankaradeva and Madhavadeva transformed Assam into a country of advanced humanism."[১] মধ্যযুগের অসমভূমিতে শংকরদেবের আবির্ভাব কোনো আকস্মিক ঘটনামাত্র ছিল না। মধ্যযুগে ভারতবর্ষে যে-ভক্তি আন্দোলন আসমুদ্র হিমাচলে এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, পূর্বভারতে শংকরদেবের আবির্ভাব ছিল তারই ফলশ্রুতি; সর্বভারতীয় এই আন্দোলনকে অনেকে একান্তই 'ধর্মীয় আন্দোলন' হিসাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন; কিন্তু আসলে এই আন্দোলন কেবল ধর্মীয় আন্দোলন মাত্র ছিল না— এ ছিল একই সঙ্গে সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক জীবনকে কেন্দ্র করে একটি জাতীয় নবজাগরণ। এই আন্দোলন সম্পর্কে বলা হয়েছে— "It was not a purely religious movement. The Vaishnavite doctrines were essentially the idealist manifestations of the Socio-economic realities of the times. It expressed itself in the cultural field as a national renaissance."[২] এই আন্দোলন সত্য, নীতি, কল্যাণ, সৌন্দর্যস্পৃহাকে অবলম্বন করে,[৩] ধর্মীয়, আর্থিক ও সামাজিক জীবনে যুগসঞ্চিত ভাষা-বর্ণ ও অর্থহীন ধর্মীয় আচারের সমস্ত রকম আধিপত্যবাদের (authoritarianism) বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চার করেছিল। রাষ্ট্রপূজা ও দেবদেবীর পূজা থেকে শুরু করে সমস্ত ঐশ্বর্যের বিরুদ্ধে ছিল এর বিদ্রোহ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "...সে ভগবানকে তাঁহার রাজসিংহাসন হইতে আপনাদের খেলাঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিল, এমন-কি প্রেমের স্পর্ধায় সে ভগবানের ঐশ্বর্যকে উপহাস করিয়াছিল।"[৪]

এ-জন্যই পূর্বভারতের সমাজ-সংস্কার ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শংকরদেবের অবদান সম্পর্কে আলোচনা একান্তই প্রাসঙ্গিক। একদিকে শবরস্বামী এবং কুমারিল ভট্টের মীমাংসা দর্শন যা ঈশ্বরকে গৌণ করে[৫] বেদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য থেকে ভ্রষ্ট যজ্ঞ ইত্যাদি কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনকেই মুক্তির উপায় বলে যখন প্রচার করছিল; অপরদিকে শংকরাচার্য যখন বেদ উপনিষদের দ্বারা অস্বীকৃত কেবলাদ্বৈতবাদের[৬] আশ্রয়ে নীতি, প্রেম, ভগদ্ভক্তি, ঈশ্বরোপাসনা এমন-কি ঈশ্বরের পারমার্থিক মূল্যকে অস্বীকার করে[৭] নির্বিশেষ ব্রহ্মকে একমাত্র সত্য[৮] এবং

জগৎকে মিথ্যা বলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এক নঞর্থক (Negative) দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিয়েছিলেন[৯] তখনই ভারতবর্ষে এর বিরুদ্ধে ভক্তি-আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, এই আন্দোলন একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি নিবেদনের আদর্শ প্রচার করে জগৎ সম্পর্কে এক সদর্থক (Affirmative) জীবনবোধের পরিচয় তুলে ধরেছিল। ভারতীয় ধর্মদর্শনের ইতিহাসে এই আন্দোলন এক 'Practical Spiritual philosophy'-র জন্ম দিয়েছিল এবং তা উপনিষদের 'naive philosophical mysticism' থেকে 'practical devotional mysticism'-এর দিকে অগ্রসর হয়েছিল। এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য "...consisted in mixing with the ordinary run of mankind, with sinners, with pariahs with women, with people who cared not for the spiritual life, with people who had even mistaken notions about it, with in fact, everybody who wanted, be it every so little, to appropriate the Real."[১০]

যে-ভক্তি আন্দোলন সেদিন ভারতবর্ষে জনজীবনের তৃণমূল স্তর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছিল তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, "...first, recognition of the unity of the people irrespective of religious considerations, secondly, equality of all before God; thirdly, opposition to the Caste system, fourthly, the faith that communion between God and man depended on the virtues of each individual, and not on his wealth or caste, fifthly, emphasis on devotion as the highest form of worship, and finally, denigration of ritualism, idol-worship, pilgrimages, and all self mortifications."[১১]

অসমে শ্রীমন্ত শংকরদেব আনীত এই আন্দোলনে উক্ত সব কয়টি বৈশিষ্ট্যই আমরা লক্ষ করেছি যেগুলো সমাজকে ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে এক আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করেছিল। সমস্ত ধরনের সাম্প্রদায়িক অনাচার-অবিচার এবং মানসিক দরিদ্রতার বিরুদ্ধে আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় আচরণের ক্ষেত্রে সর্ববর্ণের সমান অধিকারের বিষয় সামনে রেখে ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তির সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে যে-আন্দোলন সেদিন ভারতীয় জীবনে নবজাগরণের সূচনা করেছিল তারই প্রাণপুরুষ ছিলেন শ্রীমন্ত শংকরদেব। 'বামানয় শাস্ত্র'-মোহিত ভারতবর্ষের এই পূর্বপ্রান্তে কেবল সাধ্য-সাধনতত্ত্ব রচনা কিংবা তার ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে নয়, স্ত্রী-শূদ্ররা যাতে বুঝতে পারে সেই দেশীয় ভাষায় ভাগবত ইত্যাদি সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদ তথা সেইসঙ্গে শিল্প-কলা-সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বকীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে তিনি ভক্তিরসের নির্মল প্রবাহে জাতি-উপজাতি-জনজাতির মধ্যে যে-সমস্ত বৈষম্য বর্তমান সেগুলো নিশ্চিহ্ন করার এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। দেশীয় ভাষায় তাঁর ভাগবত অনুবাদ ছিল নিঃসন্দেহে হাজার হাজার বৎসরের শাস্ত্রীয় নির্দেশের বিরুদ্ধে এক সুদৃঢ় পদক্ষেপ। কেননা আমাদের দেশে শাস্ত্রবাক্যের ভয় দেখিয়ে বলা হয়েছিল—

*"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ*
*ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।।"*

অর্থাৎ, অষ্টাদশ পুরাণ এবং রামের চরিত-কথা মানুষের ভাষায় অর্থাৎ মাতৃভাষায় শ্রবণ করলে রৌরব নামক ভয়ংকর নরকে যেতে হবে। শংকরদেব শুধু এই শাস্ত্রবাক্যকেই লঙ্ঘন করলেন না, 'কৃষ্ণস্য বাঙ্ময়ী বিগ্রহ' ভাগবতের কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদে ভাগবতে অনুল্লেখিত পূর্বভারতের কিছু জনজাতির নাম ব্যবহার করে জাতীয় সংহতির এক স্বাক্ষর তুলে ধরলেন। মূল ভাগবতে ছিল :

*কিরাত হূনান্ধ পুলিন্দ পুক্কসা*
*আভীর কঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ।*
*যেঽনো চ পাপা যদু পাশ্রয়াশ্রয়াঃ*
*শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ।।* (ভা. ২/৪/১৮)

এই অংশের অনুবাদে শংকরদেব লিখলেন —

*কিরাত কছারী খাচি গারো মিরি*
*যবন কঙ্ক গোআল।*
*অসম মুলুক ধোআ যে তুরুক*
*কুবাচ ম্লেচ্ছ চণ্ডাল।।*
*আনো পাপী নর কৃষ্ণ সেবকর*
*সঙ্গত পবিত্র হয়।*
*ভকতি লভিয়া সংসার তরিয়া*
*বৈকুণ্ঠে সুখে চলয়।।*

উল্লেখ্য, কৃষ্ণের বাঙ্ময় বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবতে ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তের এইসব অবহেলিত জাতির নাম উল্লেখ করে এবং নামঘরে দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে ভাগবত গ্রন্থ স্থাপন করে

তিনি এই জাতিদেরও সম্মানিত করেছিলেন। সেদিন থেকে কৃষ্ণের বাল্যায় বিগ্রহে অলংকারস্বরূপ শোভিত হয়ে নামঘরে আশ্রয় পেয়েছেন তাঁরা। স্বয়ং ধর্মীয় প্রবক্তা হয়ে হিন্দুধর্মের এইসব নেতিবাদী শাস্ত্রবাক্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা শংকরদেব কোথা থেকে অর্জন করেছিলেন এ-প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। অবশ্যই এই নৈতিক শক্তি ভক্তি-আন্দোলনের পটভূমিতেই নিহিত ছিল। এ-বিষয়ে আলোকপাত করতে হলে আমাদের অবশ্যই প্রসঙ্গান্তরে যেতে হবে।

ভক্তি-আন্দোলনের পটভূমি আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বিশ্বসংস্কৃতির আলোকে ভারতীয় সংস্কৃতিকে দুটি ধারায় বিভক্ত করতে চাই। এর মধ্যে একটি হচ্ছে সৌর সংস্কৃতি এবং অপরটি চান্দ্র সংস্কৃতি। আসলে যারা কৃষিজীবী সম্প্রদায় তারা কৃষিকর্মের সুবিধার জন্যই অনিবার্যভাবে সূর্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাই কৃষিপ্রধান অঞ্চলের সংস্কৃতি সূর্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল প্রবলভাবে। অপরদিকে যে-সব অঞ্চল কৃষিকার্যের পক্ষে ছিল অনুপযোগী সেখানে সূর্যের ভূমিকা ছিল গৌণ, চন্দ্রের ভূমিকা ছিল মুখ্য। ওইসব অঞ্চলের জনগোষ্ঠী মূলত ছিল শস্যের সংগ্রাহক (Food gatherer), শস্যের উৎপাদক (Food producer) নয়। ফলে এরা হয়ে উঠেছে ক্ষমতার পূজারি এবং যথার্থ অর্থে শোষণজীবী বা শক্তিজীবী সম্প্রদায়। এভাবে মানব সভ্যতার প্রায় সর্বত্র গড়ে উঠেছে দুটি সম্প্রদায়। প্রখ্যাত মনীষী রুডল্‌ফ রকারের সংস্কৃতি ও জাতিবাদের প্রসঙ্গে কৃত একটি মন্তব্যের সারসংক্ষেপ এখানে উদ্ধৃত করতে পারি। তাঁর মতে, মানুষের ইতিহাসে সূচনালগ্ন থেকেই দুটি বিরোধী প্রবণতার সংগ্রাম দেখা যায়, "সম্পদের উৎপাদন বনাম ক্ষমতার পূজা; মুক্তির স্পৃহা বনাম শক্তির লালসা, সমবায়ী চেতনা বনাম যূথবৃত্তি, সংস্কৃতি বনাম রাজনীতি ও ধর্ম।"[১২] একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রবণতাই হচ্ছে ক্ষমতার ধর্ম। এই প্রবণতা থেকেই পুরোহিত সম্প্রদায় ও রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব।

এই দুই ধারাকে অবলম্বন করে দুটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল। যারা ছিল কৃষিজীবী সম্প্রদায়, শস্যের উৎপাদক তারা সূর্যের ওপর নির্ভর করেছিল, অপরদিকে যারা ছিল শস্যের সংগ্রাহক, ক্ষমতার পূজারি তারা চান্দ্র সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে উঠেছিল। এই দুই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত সভ্যতার গোড়া থেকেই লক্ষ করা যায়। এ-প্রসঙ্গে বার্ট্রান্ড রাসেলের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। "There has been a curious conflict ... between luner and solar priesthoods and luner calendars. The calendar has at all times played an important part in religion..... The very inaccurate lunar calendars were everywhere advocated by priests devoted to the worship of the moon, and the victory of the solar calendar was slow and partial. In Egypt, this conflict was at one time a source of civil war. ... Although it is rash to attribute any degree of rationality to primitive civilization, it is nevertheless difficult to resist the conclusion that the victory of the sun worshippers, wherever it occured, was due to the patent fact that the sun has more influence than the moon over the crops." [১৩]

এই দুই সংস্কৃতির মধ্যে যে-সংঘাত তার আলোকে আমরা ভারতবর্ষের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিবর্তনকে এখানে তুলে ধরতে পারি। প্রাচীন ভারতবর্ষে আর্যরা ছিলেন মূলত কৃষিজীবী সম্প্রদায়। এ-প্রসঙ্গে 'The Discovery of India' গ্রন্থে জওহরলাল নেহরু 'আর্য' শব্দটি কৃষিবাচক বলে মন্তব্য করেছেন, "The word 'Arya' comes from a root meaning to till, and the Aryans as a whole were good agriculturists and agriculture was considered a noble profession."[১৪] একই চরিত্র লক্ষ করা গেছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী গ্রিক ও ইতালীয়দের মধ্যেও : "... Free peasants such as had formed the backbone of the classical Greece and early Italy."[১৫] এমন-কি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর আদি উৎস ছিল এই কৃষিজীবী সমাজই।[১৬] ফলে স্বভাবতই আর্যদের মধ্যে সৌরসংস্কৃতি প্রাধান্যলাভ করেছিল। বস্তুত আর্যরা ছিলেন জ্যোতির সন্তান, আলোকের অগ্রদূত— 'জ্যোতিরগ্রাঃ' (ঋগ্‌বেদ ৭/১৩/৭)। তাঁরা আলোকের পথে সত্যের চিরপথিক— 'জ্যোতিশ্চক্রথুরার্যায়'।[১৭] সূর্য তাই আর্য-চেতনার প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছে। ঋক্‌সংহিতার সর্বানুক্রমণীকার কাত্যায়ন বলেছেন,

বৈদিকদের একটি দেবতা— তিনি সূর্য। "কাত্যায়নের মতে বেদের সকল দেবতাই সূর্যের বিভিন্ন রূপ মাত্র। তাঁর উক্তি 'এক এব মহানাত্মা বেদে স্তূয়তে স সূর্য ইতি ব্যাচক্ষতে'।"[১৮] এই কৃষি ও সূর্যকেন্দ্রিক সংস্কৃতির ধারাতেই কৃষ্ ধাতুজাত কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে গো-কেন্দ্রিক মানসিকতার উদ্ভব। একই ভাবে ইউরোপের ইতিহাসেও খ্রিষ্টের মধ্যে এমনই এক সদর্থক মানসিকতা জন্ম নিয়েছিল। এ-প্রসঙ্গে আমরা D.H. Lawrence-এর একটি মন্তব্য অনুধাবন করতে পারি। "The gentle cow which supports our life. Even the mother of Jesus had with her in the stable the cows of peace and plenty, when Jesus was born."[১৯]

কিন্তু ভারতবর্ষে আর্যভাষী সমাজের মধ্যেই সৃষ্টিজীবী সম্প্রদায়ের বিপরীতে একদল nomadic সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে প্রধান হয়ে উঠেছিল। শক্তিজীবী এই জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ইন্দ্র। ইন্দ্রই ছিলেন ভারতবর্ষে আগত প্রথম আক্রমণকারী দলের নেতা। ইন্দ্র সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Indra is a symbol of a later wave of Aryan invaders and immigrants who came into India, on one hand, and reached the Middle-east, on the other. It is these Aryans who put an end to the culture maturing in the Punjab."[২০] ইন্দ্র আসার আগেই ভারতে আর্য সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[২১] ইন্দ্র ছিলেন মূলত যুদ্ধজীবী নর্ডিক আর্য গোষ্ঠীর নেতা, "The Nordic Aryans who invaded India Between 1500-1200 B.C. were a nomadic warlike people."[২২]

অতঃপর ভারতীয় জীবনধারা স্পষ্টত দু-ভাগে বিভাজিত হয়ে গেল। একদিকে বরুণ-বিষ্ণু-কৃষ্ণের জনমুখী শস্য-উৎপাদনকারীদের ধারা, অপরদিকে ইন্দ্রের দমনপন্থী শক্তিজীবী আহারসংগ্রহকারীদের ধারা। কৌশীতকি উপনিষদে ইন্দ্রের স্বভাবের যে-বর্ণনা রয়েছে তা আমাদের মতের অনুকূলে সাক্ষ্য বহন করে। সেখানে ইন্দ্রের বাচনিক দিবোদাসের ছেলে প্রতর্দনের উদ্দেশে উক্ত হয়েছে, "ত্বষ্টার ছেলে ত্রিশীর্ষকে আমি হত্যা করিয়াছি। অরুমর্গ নামক যতিকে আমি কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণ করাইয়াছি। যুদ্ধের অনেক সন্ধি ভঙ্গ করিয়া আমি দিবালোকে প্রহ্লাদের অনুচরদিগকে, অন্তরীক্ষে পৌলোমদিগকে এবং পৃথিবীতে কালকাশ্যদিগকে বধ করিয়াছি। এইসব কাজ করিতে আমার একটি কেশও বাঁকিয়া যায় নাই। যে আমাকে এই ভাবে জানিবে, সে যদি মাতৃবধ, পিতৃবধ, চুরি, ভ্রূণহত্যা ইত্যাদি মহাপাতকও অতীতে করিয়া থাকে, তবু তাহার মনে কিছুমাত্র অনুশোচনা হইবে না, অথবা বর্তমানেও এই সব পাপ করিবার সময় তাহার মনে কোনো দুঃখ হইবে না, অথবা তাহার মুখের উজ্জ্বলতা কিছুমাত্র কমিয়া যাইবে না।"[২৩]

এখানে লক্ষণীয়, শক্তিজীবী যুদ্ধজীবী ইন্দ্রের ধারায় ন্যায়ের, সত্যের, ঋতের কোনো সম্পর্ক ছিল না; অপরদিকে কৃষিজীবী বরুণ-বিষ্ণুর ধারায় ঋতের ধারণা প্রধান। ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই দুই ধারার মধ্যে একটি সংঘাতের চিত্র ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সংঘাতের চিত্র প্রথম লক্ষ করা যায় ঋগ্বেদের কয়েকটি মন্ত্রে[২৪] এবং বিস্তারিত ভাবে শ্রীমদ্ভাগবতে। বস্তুত নীতিরহিত শক্তিজীবীদের বিরুদ্ধে সত্য, ঋত তথা যুক্তিকে অবলম্বন করে কৃষ্ণের সংঘাত ভাগবতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। কৃষির সুবিধার্থে জলের জন্য ইন্দ্রের পূজা করা হয়, নন্দ প্রভৃতি বৃদ্ধদের মুখে এই কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্র পূজার বিরোধিতা করে বলেছেন—

*রজসা চোদিতা মেঘা বর্ষত্যম্বুনি সর্বতঃ।*
*প্রজাস্তৈরেব সিধ্যন্তি মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি ।।*

(ভাগবত ১০। ২৪।২৩)

অর্থাৎ, 'প্রকৃতির স্বভাবেই মেঘ হয় এবং মেঘ সর্বত্র বারি বর্ষণ করে, তাতেই জীব বাঁচে। এখানে মহেন্দ্রের কিছু করার নেই।' ঋতের সহায়তায় শাস্ত্রের আধিপত্য এভাবেই কৃষ্ণ খর্ব করেছিলেন।[২৫]

ভারতবর্ষের ইতিহাসে গুপ্তযুগ থেকে এই কৃষিবিরোধী শক্তিজীবী শোষণপন্থীদের ধারা প্রাধান্যলাভ করে। এই ধারায় পুরোহিত তন্ত্রের আবির্ভাব এবং সেইসঙ্গে বিভিন্ন শক্তি-দেবদেবীর অনুপ্রবেশ ঘটে। "At the end of the Gupta period goddesses rose to prominence, together with magical cults, religious sexuality and a new form of animal sacrifice, which increased in

importance throughout the early Middle ages."[২৬]

নবোদ্ভূত এই আচারকেন্দ্রিক পুরোহিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে বেদের ঋষিকবিদের পার্থক্য ছিল ব্যাপক— "The character and functions of these new ritual priests were obviously different from those of the poet-priests."[২৭] এই আচারকেন্দ্রিক পুরোহিত ব্রাহ্মণরা ছিলেন মূলত আধিপত্যবাদী।[২৮] বস্তুত কৃষিজীবী বা ফসল-উৎপাদনকারীদের বিরুদ্ধে পুরোহিত সম্প্রদায়ের সক্রিয়তা তাঁদের শোষণজীবী চরিত্রকেই প্রতিষ্ঠিত করেছিল।[২৯] নীতির সঙ্গে এঁদের কোনোদিনই সম্পর্ক ছিল না অথবা জনসাধারণের নৈতিক উন্নতির দিকেও এঁরা কোনোদিনই নজর দেননি।[৩০] শুধু তা-ই নয়, ইতিহাসবিদের বিচার অনুযায়ী ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আবির্ভাব যে-কোনো বিদেশী আক্রমণের চেয়ে ছিল মারাত্মক— "far deadlier than any invasion."[৩১] কারণ সামন্তবাদের দ্বারা পুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগৎকেও সংকীর্ণ করে এনেছিল।[৩২] এঁদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল (চতুর্থ শতাব্দী) থেকে শুরু করে অদ্বৈতবাদী শংকরাচার্য পর্যন্ত (নবম শতাব্দীর প্রারম্ভ) ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রবল হয়ে উঠেছিল। শূদ্রদের লাঞ্ছনা করার জন্য শংকরাচার্য যে-সব শাস্ত্রবচনের সাহায্য নিয়েছিলেন, সেই গৌতমধর্মসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ গুপ্তরাজাদের সময়েই লিখিত হয়েছিল।[৩৩] আসলে লাঙল-বিরোধী এই স্মার্ত ব্রাহ্মণরা জগৎ ও জীবনের প্রতি একটি নঞর্থক ধারণাকেই ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।[৩৪] এ-ক্ষেত্রে মায়াবাদী শংকরাচার্যের ভূমিকা ছিল অন্যতম।

অতঃপর ভারতবর্ষে সাংস্কৃতিক সংঘাত শুরু হল কৃষি ও সূর্যকেন্দ্রিক বিষ্ণু-কৃষ্ণ বনাম জাদুমুখী কৃষি-বিরোধী চন্দ্রকেন্দ্রিক শিব-শক্তির মধ্যে। একদিকে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কৃষিজীবী শূদ্র-বৈশ্য-ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়, অন্যদিকে সামন্ত প্রভু ও পুরোহিত ব্রাহ্মণের দল; শিব ও শক্তিই ছিল তাঁদের একমাত্র আরাধ্য। "The real underlying struggle is known to have been between the great feudal landlords who worshipped Siva and his consort goddess as against the smaller but more enterprising entrepreneurs who opted for Krishna or Vishnu-Narayana."[৩৫] এ-সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে, "Siva had then become the god of the great barons, whereas the cowherd boy Krishna remained associated with small producers."[৩৬] একনায়কত্ববাদী সামন্ত প্রভু এবং কৃষিবিরোধী জাদুমুখী ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাঁদের আদর্শের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন ভীতিপ্রদ শিব তথা শক্তিদেবীদের মধ্যে। কেননা, "...Siva has a rather ferocious and dangerous side to his character. Vishnu is generally thought of as wholly benevolent. The god works continuously for the welfare of the world."[৩৭]

এই নিপীড়নধর্মী গণতন্ত্রবিরোধী ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, মায়াবাদী শংকরাচার্যের নির্বিশেষাদ্বৈতবাদ এবং আচারকেন্দ্রিক বহুদেবদেবীবাদের বিরুদ্ধে সেদিন বৈষ্ণব ভক্তি-আন্দোলন 'সৌন্দর্য-মাধুর্য-চৈতন্য-মানবতার' আলোকে ভারতীয় সমাজের চরম অন্ধকার দূর করার চেষ্টা করেছিল। লক্ষণীয়, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে বিশ্বাসীরা সেদিন সমস্ত ভারতবর্ষে একযোগে এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। ভক্তি-আন্দোলন শংকরাচার্যের নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদ, ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে সর্বমানবের সম-অধিকার, ঐশ্বর্যের বিরুদ্ধে মাধুর্য, ভীতি সঞ্চারের পরিবর্তে প্রেম এবং সর্বোপরি বিবর্তবাদের বিরুদ্ধে পরিণামবাদের প্রতিষ্ঠা করে জগৎ ও জীবনের প্রতি এক সদর্থক জীবনদর্শনের জন্ম দিয়েছিলেন। এই ধারাতেই অসমে আমরা পেলাম শ্রীমন্ত শংকরদেবকে।

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সূর্যোপাসনার বিশেষ উল্লেখ ও নিদর্শন পাওয়া গেছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ১০৯ অধ্যায়ে সূর্য-উপাসনার জন্য কামরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ-ছাড়াও কালিকাপুরাণ, যোগিনীতন্ত্র এবং প্রাচীন অসমিয়া সাহিত্যে কামরূপ যে সূর্যোপাসনার স্থান তার উল্লেখ পাওয়া যায়। অসমের বিভিন্ন স্থানে সূর্যমন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। তেজপুরের স্থাননামটিও 'সৌর তেজপুর' অর্থাৎ সৌর তেজের দ্বারা পূর্ণ নগর থেকেই হয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন।[৩৮] অসমের পূর্ব প্রান্তে স্থিত দিক্করবাসিনীর 'দিক্কর' শব্দের অর্থ হচ্ছে সূর্য। এ থেকে এই রাজ্যের পূর্বাঞ্চলেও যে সূর্য পূজার

প্রচলন ছিল তা জানা যায়।[৩৯] "কন্দলী রাজ্যও সূর্য রাজ্য ছিল। সূর্যের পতাকার নাম ধর্ম। সূর্যের সহস্র নামের একটি নাম হচ্ছে 'ধর্ম কন্দলী'।....'ডবকা' শব্দটি দেবার্কের অপভ্রংশ। দেবার্ক সূর্যরাজ্য।"[৪০] হাজোস্থিত হয়গ্রীব মন্দিরের হয়গ্রীব 'আদিত্য ভট্টারক' নামেও পরিচিত। এই 'ভট্টারক' শব্দের অর্থ রবি। রবিবারকে ভট্টারক বারও বলা হয়।[৪১]

সূর্যের উপাসনা এবং কৃষিকর্মের প্রাধান্যের জন্যই অসমে ভক্তি-আন্দোলন শংকরদেব-মাধবদেবের জীবনকৃতিকে অবলম্বন করে সার্থকতা লাভ করেছিল বলে পণ্ডিত গ্রিয়ার্সন সাহেবও স্বীকার করেছেন। বঙ্গদেশের মতো সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারা অসমে প্রাধান্য লাভ করেনি বলেই কালী-দুর্গার পূজা এখানে প্রধান হয়ে ওঠেনি। শংকরদেব মূলত ভাগবতকে অবলম্বন করে যে-বৈষ্ণবধর্ম অসমে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার মূল কেন্দ্রে ছিলেন 'দৈবকীর পুত্র এক কৃষ্ণমাত্র দেব'; ফলত যজ্ঞ ইত্যাদি আচারকেন্দ্রিক যে-ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ধারা হিন্দুধর্মকে পীড়িত করছিল তার বিরোধিতায় একদিন আমরা পৌরাণিক চরিত্র কৃষ্ণকে পেয়েছিলাম, ঐতিহাসিক চরিত্র ভগবান বুদ্ধকেও পেয়েছিলাম। কৃষ্ণই প্রথম যজ্ঞ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন । অঙ্গিরস ঋষি তাঁকে যজ্ঞের একটি সহজ প্রণালি শিখিয়েছিলেন, এই যজ্ঞের দক্ষিণা হচ্ছে তপস্যা, দান, সরলতা (আর্যব), অহিংসা ও সত্যবাদিতা, "অথ যত্তপো দানমার্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি তা অস্য দক্ষিণাঃ।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৩।১৭।৪-৬) অসমে শংকরদেবও সৌর সংস্কৃতিকেন্দ্রিক ধারায় আবির্ভূত হয়ে চান্দ্র সংস্কৃতির ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ধারার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন এবং ধর্মীয় আচারের অচলায়তন থেকে মুক্তির পথ ঘোষণা করেছিলেন। উল্লেখ্য, শংকরদেব শুধু সামন্ততন্ত্র-সমর্থিত শংকরাচার্যের নঞর্থক জীবনদর্শনের বিরুদ্ধেই নয়, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র-সমর্থিত বহু দেবদেবীর পূজার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছিলেন। বস্তুত গুপ্তযুগের পরেই ভারতবর্ষে তন্ত্র ও জাদুমুখী দেবদেবীরা প্রধান হয়ে উঠেছিলেন। এ-ক্ষেত্রে বৈষ্ণবধর্মের যে-প্রতিবাদ সেদিন লক্ষ করা গিয়েছিল তা শংকরদেব প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মেও সমানভাবে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল। এই প্রতিবাদ সম্পর্কে আমরা লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করতে পারি— "Vaishnavism checked the elaborate rituals, ceremonials, vratas, fasts and feasts prescribed by Smritis and Puranas for the daily life of a Hindu and also the worship of various deities like the Sun, the Moon, the grahas or planets, etc. enjoined by the priestly Brahmin class for the sake of emoluments and gain. It enjoined the worship of no other deities except God Narayana of Upanishad. ... Devotion to one deity was the teaching of this school... and the object was to enthrone Hinduism once more on its old pedestal, restore it to the ancient purity of the Upanishad days and free it from the non-Aryan influences that had given it a mixture of tantric rituals and worship of many gods."[৪২]

সমাজকে অর্থহীন আচারের বেড়াজাল থেকে, যা কেবলই আমাদের বাঁধে, মুক্তি দেয় না, শংকরদেব সেই নিশ্ছিদ্র যান্ত্রিক আচারের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে যথার্থ সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। সর্বোপরি উচ্চবর্ণের দোহাই দিয়ে ব্রাহ্মণদের যে-আধিপত্যবাদ সেদিন সমাজে তীব্র হয়ে উঠেছিল তা থেকে সমাজকে বেরিয়ে আসার পথ প্রদর্শন করেছিলেন তিনি।

তাঁর ধর্মীয় নির্দেশের সমস্তই ছিল নীতিভিত্তিক, যেমন—

ক) *সকলো প্রাণীক দেখিবেক আত্মসম।*
*উপায় মধ্যত ইটো অতি মুখ্যতম ।।*(কীর্তন - ১৮২৫)

খ) *নমারিবে পশুক এড়িবে মাংস-আশা।*
*দেবকো উদ্দেশি পশু ন করিবে হিংসা।।*
(নিমি নবসিদ্ধ-৩৪৮)

গ) *চণ্ডালো হরিনাম লবে মাত্র।*
*করিবে উচিত যজ্ঞর পাত্র ।।*(কীর্তন-১১৯)

ঘ) *প্রাণী ভয় ভীত ভৈলে করিবে রক্ষণ।।*
*বিশেষত মহন্তর এহি ব্যবহার।*
*পরজীব রাখে জীব দিয়া আপোনার।।*
*অভয় দানত পরে ধর্ম নাহি আন।*
*কোটি অশ্বমেধো তার নুহিকে সমান ।।*
(ভাঃ ৮।৩৯৭-৯৮)

সামন্ততান্ত্রিক ধারার সমর্থক[৪৩] ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ও শংকরাচার্য

ভারতবর্ষের বুকে বর্ণভেদের যে-ঘোড়া হাঁকিয়েছিলেন, শংকরদেব অসমে ভাগবতকে কেন্দ্র করে তার বিরোধিতা করেছিলেন। শংকরাচার্য যে-শূদ্রকে পদযুক্ত শ্মশান বলে পশুর স্তরে নামিয়ে দিয়েছিলেন, সেখান থেকে শংকরদেব ভাগবত গ্রন্থকে ভিত্তি করে সেই শূদ্রদের মানুষের স্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—

*সিটো চাণ্ডালক গরিষ্ঠ মানি।*
*যার জিহ্বাগ্রে স্রবে হরিবাণী।।*

ভাগবতের অনুসরণেই তিনি শূদ্রাণী সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

*তীর্থকো পবিত্র করে ইটো কোন্ চিত্র।*
*তোর দরশনে হয় জগত পবিত্র।।*(ভক্তি প্রদীপ-৯৪)

অসমে শ্রীমন্ত শংকরদেবের উদার ও মানবতাবাদী ধর্মমত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন— "Naturally this went counter to the spirit of traditional Brahmanism based on the notions of caste and of worship through the various manifestations of the Deity."[৪৪] এর ফল হয়েছিল মারাত্মক, একযোগে ব্রাহ্মণরা শংকরদেবের বিরোধিতা করেছিলেন বলেও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন। শুধু তা-ই নয়, "The hostility of the Brahmans and the indifference of the Ahom kings and sometimes their cruelty due to their fear of revolutionary doctrines upsetting the equilibrium of the state Sankardeva's own son-in-law was beheaded at the order of the Ahom king Su-hung-mung made him leave his homeland near town of Nowgong within Ahom territory and seek asylum with the Koch Bihar king Naranarayana."[৪৫]

সমাজ-সংস্কারে শংকরদেবের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল এই ধর্মের গৃহমুখীনতা বা গার্হস্থ্য ধর্মের অসাধারণ স্বীকৃতি। শংকরাচার্যের মতবাদের দ্বারা সমর্থিত হয়ে যখন মধ্যযুগে জীবনবিমুখ বৈরাগ্যধর্ম প্রধান হয়ে উঠছিল এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটি নেতিবাদী ধারণাকে পুষ্ট করছিল তখন শংকরদেব প্রচার করেছিলেন—

*গৃহতে থাকিয়া হরিক স্মরিয়া*
*মোক্ষ সাধা হরিনামে।*

অথবা—

*আরু যাইবে নালাগে নৃপতি তপোবন।*
*গৃহে গতি পায় করি শ্রবণ কীর্তন।।*

এমন-কি 'কীর্তন ঘোষা'র 'নারদর কৃষ্ণদর্শন' অংশে নারদ কৃষ্ণকে দর্শন করতে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে তাঁকে গৃহস্থ রূপেই আবিষ্কার করেছিলেন। এ-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "মানুষ মাত্রেই গৃহী হওয়াই স্বাভাবিক এবং না হওয়াটাই ব্যতিক্রম, ফলে একজন গৃহীর পক্ষে তাঁর ভজনীয় ঈশ্বরকে গৃহীরূপে কল্পনা করলে ঈশ্বরত্বের কোন লাঘব হয় না, বরং সাধকের পক্ষে সুবিধাই হয়,"[৪৬] সেজন্যই নাগর কৃষ্ণের পরিবর্তে শংকরদেব গৃহী কৃষ্ণকে অসমিয়া বৈষ্ণবদের ভজনীয় ঈশ্বররূপে উপস্থাপিত করেছিলেন। সংসারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ আনন্দের মধ্যে কৃষ্ণকে দর্শন করাই হল প্রকৃত ভক্তের একান্ত উদ্দেশ্য। গীতাতেও বলা হয়েছে— 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি সমহাত্মা সুদুর্লভঃ।' (গীতা -৭।১৯ ) সে-জন্যই শংকরদেবের বৈষ্ণবধর্মে সন্ন্যাসী বা গৃহত্যাগী নেই।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, গার্হস্থ্য ধর্মকে স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে গৃহী কৃষ্ণকে ভজনীয় রূপে প্রতিষ্ঠা করে শংকরদেব ত্যাগের পরিবর্তে 'মার্জিত ভোগবাদ'-কেই কি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন? হিন্দুধর্মের সমস্ত শাখায় কিন্তু ত্যাগের মহিমা উচ্চকণ্ঠে কীর্তিত হয়েছিল। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে গোপীদের সর্বস্ব ত্যাগ ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ। এই বিতর্ক সম্পর্কে আমরা বলতে পারি, ভারতীয় জীবনদর্শনরূপ মহাসাগর মন্থন করে শংকরদেব যে-অমৃত পরিবেশন করেছিলেন সেখানেও ত্যাগের প্রসঙ্গ স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে। পরমপুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে চরম পুরুষার্থ মুক্তিবাঞ্ছা ত্যাগ থেকে শুরু করে বিষয়-বিষধরকে ত্যাগের কথাও তিনি বলেছেন; কিন্তু এক্ষেত্রে শংকরদেবের সঙ্গে অন্যান্য গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর এক ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান।

যেহেতু স্ত্রী-পুত্র-সংসার, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ইত্যাদি সমস্তই মায়ার বিভ্রম, সে-জন্যই এই সমস্ত ত্যাগ করে কৌপীনবন্ত হয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন শংকরাচার্য। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই সমস্ত মায়িক ত্যাজ্য বস্তুকে কোথায় ত্যাগ করব

হয়, অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা আছে সবই যদি ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত হয় তাহলে যেখানেই আমরা ত্যাগ করি না কেন তা ঈশ্বরেই ত্যাগ হবে। সে-জন্যই বেদ থেকে শুরু করে গীতা-ভাগবতেও ঈশ্বরের উদ্দেশে ত্যাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শংকরাচার্য যে-ত্যাগের কথা বলেছেন তা ঈশ্বরের উদ্দেশে নয়, এখানে ত্যাগ বলতে বোঝায় মিথ্যা মায়িক বস্তুকে শূন্যের মধ্যে ত্যাগ, এই ত্যাগ জীবনে নিঃস্বতাকেই ডেকে আনে। অন্যদিকে ঈশ্বরের উদ্দেশে ত্যাগ করলে নিঃস্ব হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, ভক্ত প্রকৃত আত্ম-ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যান্বিত হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, "পূর্ণতর রূপে লাভ করবার জন্যই আমাদের ত্যাগ।"[৪৭] এই প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য উল্লেখ করতে চাই।— "আমার শূন্যগুলিকে যেই সেই একের দক্ষিণ পরপর বসাতে থাকি অমনি তা দশ হয়, একশ হয়, সহস্র হয়, অযুত লক্ষ, নিযুত কোটি, অনন্ত হয়। ...এ এক আশ্চর্য খেলা, পূর্ণকে পাবার জন্য শূন্য হওয়া, বাসি জল ফেলে ফেলে বারে বারে দেহের কলসীতে নতুন জল ভরা, আত্মাকে পাবার জন্য আত্মহারা হওয়া।"[৪৮] এই কথাই আমরা শুনেছি অন্যত্র, "... ত্যাগ তো শূন্যের মধ্যে নয়। যদ্ যদ্ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ। যা-কিছু করবে সমস্তই ব্রহ্মে সমর্পণ করবে। তোমার সংসারকে, তোমার প্রিয়জনকে, তোমার সমস্ত কিছুকেই তাঁকে নিবেদন করে দাও— এই-যে ত্যাগ এ যে পরিপূর্ণতার মধ্যে বিসর্জন।"[৪৯] অসমিয়া সমাজে ত্যাগের এই সদর্থক দিকটিকেই মধ্যযুগে তুলে ধরেছিলেন শ্রীমন্ত শংকরদেব :

*পুত্র পত্নী সবাকো সেবক করি দিব।*
*আপুন প্রাণকো কৃষ্ণ পাওঅত অর্পিব।।*

(নিমি নবসিদ্ধ-১৫১)

স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করে বানপ্রস্থ গ্রহণ নয়, জীবনের সম্যক বিন্যাসই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য।

জীব ও জগৎ সৃষ্টির মূলে বিবর্তবাদের পরিবর্তে পরিণামবাদকে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীকৃতি দেওয়ার ফলেই শংকরদেব জগৎ সম্পর্কে এমনই এক সদর্থক জীবনবোধের জন্ম দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর আনীত জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে নৈতিকতার যে-সংযোজন তার মূলে রয়েছে পরিণামবাদ—

ক) *জীব অংশে তুমি প্রবেশিলা গায়ে গায়ে।* (কীর্তন-১৬৭৪)

গ) *তোমারে সে অংশ আমি যত জীব জাক।* (ভা. ১০।৭৩২)

দ্বিতীয়ত, নির্বিশেষ ব্রহ্মের পরিবর্তে একাধারে সবিশেষ এবং নির্বিশেষ ঈশ্বরের স্বীকৃতি পার্থিব জীবনে এক লোকোত্তর এষণার সঞ্চারে সার্থকতা অর্জন করেছিল। বস্তুত উত্তর-পূর্ব ভারতের জনজীবনে যে-সাংস্কৃতিক আবেশ তৈরি হয়েছিল তারও মূল নিহিত ছিল এখানেই। শংকরদেবের ঈশ্বর জীব-জগৎ বিবিক্ত কোনো বাক্যাতীত শূন্যতা নয়। মাধবদেব ঈশ্বর সম্পর্কে বলেছেন,

*তুমি প্রভু নির্গুণ গুণর সীমা নাই।*
*নির্গুণ হোঅয় জীব সোহি গুণ গাই।।* (বরগীত-৮৮)

নির্গুণোগুণী ঈশ্বরকে ভক্তের অধীন করে উপস্থাপিত করায় ভক্তকে যেমন বৃহতের সঙ্গে অন্বিত করা হয়েছিল, তেমনই বৃহৎ-কে দৈনন্দিন ক্ষুদ্রতার মধ্যে নামিয়ে এনে যথার্থ সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। 'পুলুকামো হি মর্ত্যঃ'— অনন্ত কামনার দাস মানুষের অফুরন্ত কামনায় ইন্ধন না-জুগিয়ে জীবের আত্মসম্মানকে ফিরিয়ে এনেছিলেন তিনি। ধর্মীয় সোপানের শীর্ষতম স্থানাধিকারী মুক্তি-কামনাকেও অস্বীকার করে শংকরদেব বৈদিক ভারতবর্ষের ব্রহ্মভাবনার সঙ্গে অর্থাৎ বৃহতের ভাবনার সঙ্গে মধ্যযুগের যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। তাঁর বিশাল রচনায় ধ্বনিত হয়েছিল, মুক্তি নয়, সুখস্পৃহা নয়— 'নালাগে সুখভোগ নালাগে মুকতি'; চাই বৃহৎ-কে, সেই বৃহৎ-কে প্রকাশ করার অভীপ্সা, বেদের ভাষায় "বৃহৎ বদেম বিদথে সুবীরাঃ"— 'বীরোচিত মহিমায় বলব বৃহতের কথা' (ঋগ্‌বেদ ২।১।১৬)। এই বৃহতের কথাই ব্যক্ত হল শংকরদেবের রচনায় অহৈতুকী ভক্তি নিবেদনের মধ্য দিয়ে ; বিশ্বকবির ভাষায় বলা যায় যে আমরা নিতে নিতে ফকির হব না, আমরা দিতে দিতে রাজা হব। শংকরদেব মানুষকে রাজা করার যে-অভিনব প্রয়াস করেছিলেন তাতেই তান্ত্রিক অসমে এক সাংস্কৃতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই যোগিনীতন্ত্রে যেখানে ঘোষিত হয়েছিল : 'পিত্বা পিত্বা পুনর্পিত্বা যাবৎ পততি ভূতলে/উত্থায়চ পুনর্পিত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।' সেখানে শংকরদেব আপামর জনসাধারণকে বললেন ঃ 'পিয়ু পিয়ু ভাই ভাবক সকল হরিনাম রস সার'। যোগিনীতন্ত্রে যেখানে বলা হয়েছিল—

*বেশ্যামধ্যগতং বীরং কদা পশ্যামি সাধকং*
*এবং বদতি সা কালী তস্মাদ্বেশ্যা পরো ভব।*

অর্থাৎ মহাকালী বলছেন, 'বেশ্যামধ্যগত বীরদের আমি দেখতে চাই। সেজন্যই বীর সাধনে বেশ্যাপরায়ণ হও।' তান্ত্রিকরা অবশ্য এই অংশের শাস্ত্রীয় ও দার্শনিক ব্যাখ্যা করবেন। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয়, "শক্তিপূজার যে-অর্থ লৌকিক বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত, সে-অর্থকে অসংগত বলা যায় না; কারণ লোকপ্রচলিত কাহিনী এবং রূপকচিহ্নে সেই অর্থই প্রবল এবং সভ্য ও বর্বর সকল দেশে সকল ভাবেই শক্তিপূজা চলছে— অন্যায় অসত্য সে-পূজায় লজ্জিত নয়, লোভ তার লক্ষ্য এবং হিংসা তার পূজোপচার।"[৫০]

এই ধর্মীয় পটভূমিতে শংকরদেব জীবকে শোনালেন, 'মন মেরি রাম চরণহি লাগু।' বললেন,

*ওরে সখি পেখোরে, কঞ্জলোচন চললি নন্দকুমারা।*
*ইন্দু বদন, কোটি মদন, রূপে তুল নুহি যারা।।*(বরগীত-২০)

অথবা—

*যত জপ তীরিথ করসি গয়া কাশী;*
*বাসী বয়স গোয়াই।*
*জানি যোগ যুগুতি মতি মোহিত;*
*বিনে ভকতি গতি নাই।।* (ওই-১৩)

নীরস শাস্ত্র-নির্দেশিত জগৎ থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতকে এক সাংগীতিক জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র দিয়েছিলেন শংকরদেব। অবশেষে সংগীতের মধ্য দিয়েই, যিনি বাক্য ও মনের অতীত তাঁকে ধরতে চেষ্টা করলেন তিনি। সংগীত সমস্ত শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা— আদি আর্ট। "সংগীত হইতেছে শূদ্র; সংগীতের স্থান সকলের নীচে, কিন্তু অধম বলিয়া নয়— সে সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে বলিয়া।"[৫১] তাই আধ্যাত্মিক সাধনপথে যত ধরনের সাধনতত্ত্ব এখন পর্যন্ত ব্যাখ্যাত হয়েছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হচ্ছে সংগীত— 'গানাৎ পরতরং নহি'। তাই গানই হয়ে উঠেছে আর্ত মানুষের, আবার আনন্দিত মানুষেরও একমাত্র অঞ্জলি সেই জয়ী ও চির অপরাজিতের উদ্দেশে— "ত্বাম অভি প্রণোনুমো জেতারম্ অপরাজিতম্" (ঋগ্‌বেদ ১।১১। ২)। বেদের ঋষি বলেছেন, "প্রতি সূক্তানি হর্ষতম্" (ঋ-১।৯৩।১)। 'প্রতি সূক্তে অর্থাৎ সূক্তে সূক্তে তুমি আনন্দিত হও', এক গভীর প্রত্যয়ে তাঁরা বিশ্বাস করেছেন, 'আমাদের এ গান তিনি শুনতে পেয়ে আসবেনই'— "আ ঘা গমদ্ যদি শ্রবৎ" (ঋ-১।৩০।১)। শংকরদেবও বললেন, "গৃহে গতি পায় করি শ্রবণ কীর্তন।" তাঁর বরগীত ছিল পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে নিবেদিত মর্তমানুষের এক গভীরতম আকুতি। শ্রীঅরবিন্দ একেই বলেছেন, 'Fire of Human Aspiration', রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

*ধায় যেন মোর সকল গভীর আশা*
*প্রভু, তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে।*

বিষয়-বিষধরের স্পর্শে জর্জরিত মানবাত্মার আকুল প্রার্থনা শংকরদেব বাঙ্ময় করে তুলেছেন বরগীতের প্রতিটি সংগীতে। বরগীত ছিল যথার্থই 'বৃহতের গীত'— ভূমিকে অতিক্রম করে ভৌম-বাসনার স্পর্শশূন্য ভূমার সংগীত। ভক্ত ও ঈশ্বরের মধ্যে সেতু স্থাপন করার এক ভাবতরঙ্গ হচ্ছে বরগীত— তিমিরবিদারী এক ভাগবত-গঙ্গোত্রী। ঋগ্‌বেদের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, 'বাচো মধু' অর্থাৎ শব্দের মধু। এই বরগীতের মধ্য দিয়েই শংকরদেব বিশ্বসংস্কৃতির সুরতরঙ্গের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিলেন অসমিয়া ভাষাকে তথা অসম ভূমিকে।

ভূমি ও ভূমার মধ্যে এই-যে সেতুবন্ধন, যা সংস্কৃতিসম্পন্ন জীবনবোধেরও মূল উৎস, তার ভিত্তি রচিত হয়েছে পরিণামবাদেই। বিবর্তবাদের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক থাকতে পারে না। মূলত পরিণামবাদী বলেই শংকরদেব ভূমির সঙ্গে ভূমার, ঈশোপনিষদ-কথিত বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যার[৫২] সংযোগ ঘটাতে সমর্থ হয়েছিলেন। শংকরাচার্য যেখানে মানবদেহকে 'মাতাপিত্রোর্মলোদ্ভূতং মলমাংসময়ং বপুঃ'[৫৩] অর্থাৎ এই দেহ হচ্ছে মাতা ও পিতার মল থেকে জাত মলমাংসময় দেহ বলে একে চণ্ডালের ন্যায় অস্পৃশ্যজ্ঞানে পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেখানে শংকরদেব ঘোষণা করেছিলেন,

(ক) *কোটি কল্প অনন্তরে জীবে নরদেহ ধরে*
*যদি থাকে পুণ্যর সঞ্চয়।* (ভা. ১০।১৪৭৯)

(খ) *মোহোর সেবার যোগ্য মনুষ্য শরীর।* (ওই ১১।১২৯)

শুধু তা-ই নয়, সাধনপন্থার একান্ত প্রতিবন্ধক স্বরূপ জীবের বহির্মুখী ইন্দ্রিয় চেতনাকেও শংকরদেব নিরুদ্ধ করার নির্দেশ দেননি, বরং এই বহির্মুখী ইন্দ্রিয়সমূহকে ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত

করে ঈশ্বরমুখীন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বহির্মুখী ইন্দ্রিয়ের বর্ণনায় তিনি লিখেছিলেন :

*নাসা গন্ধ মধুর রস রসনা, শ্রবণ, বিবিধ ধ্বনি ধায়।*
*নয়না রূপ, পরশ ত্বচ চাহে ভজোহো কাহে পহু পায়।।*

(বরগীত-৫)

অবশেষে হৃষীকের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের সেবার অথবা ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা ঈশ্বরের আস্বাদনের একটি অপূর্বমধুর চিত্র পরিবেশন করে ইন্দ্রিয়ের সদর্থক দিকটি তুলে ধরেছিলেন তিনি। কংসের রাজসভায় প্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের লোকাতীত রূপ-মাধুর্য দর্শনের বর্ণনায় ভাগবতের অনুসরণে শংকরদেব লিখেছেন :

*নয়নে পিবয় যেন চেহ্লেকে জিহ্বায়।*
*বাহুয়ে আলিঙ্গে যেন শুঙ্গে নাসিকায়।।*

(কীর্তনঘোষা-১১৮৫)

আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে শংকরদেবের এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রক্ষেপ যে-নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিল তা সর্বভারতীয় ভক্তি-আন্দোলন প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের মূল্যায়ন থেকে লক্ষ করতে পারি : "বৈষ্ণবধর্ম, বিশেষত প্রেম ও সৌন্দর্যের এবং ভগবানের মধ্যে মানুষের সমগ্র আনন্দময় আত্মার পরিতৃপ্তি সাধনেরই ধর্ম, এমনকি ইন্দ্রিয়সুখপরতন্ত্র জীবনের বাসনা ও প্রতিরূপ সকলকেও ইহার দিব্যদৃষ্টিতে দিব্যভাবে আত্মানুভূতির মূর্তিতে পরিণত করা হইয়াছিল। জগতে এরূপ ধর্ম আর কোথায় আছে যাহা এই বিশাল উদারতা দেখাইতে পারিয়াছে অথবা যাহা আধ্যাত্মিকতা ও আনন্দে পৌঁছিবার জন্য সমগ্র প্রকৃতিকে এরূপ বৃহৎ শক্তিশালী ও বহুমুখীরূপে, এত বৃহৎ ও উচ্চভাবে নিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছে?"[৫৪] সর্বভারতীয় এই পদক্ষেপের ক্ষেত্রে শংকরদেব কীভাবে পূর্বভারতকে এক সাংস্কৃতিক সম্পর্কে অন্বিত করেছিলেন তা এখানে লক্ষ করা গেল। বস্তুত শংকরদেবই প্রথমে ভারতের এই পূর্বপ্রান্তে ভারত-চেতনার জন্ম দিয়েছিলেন এবং প্রাচীন ঋষিদের 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'-র অনুসরণে 'ও ওয়া নরলোক হরি ভজিয়োক' বলে আহ্বান জানিয়ে সমগ্র বিশ্বকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শংকরদেবের অবদানের বিষয়টি প্রসঙ্গে আমরা শুধু দেখাতে চেয়েছি, এই দুই ক্ষেত্রে অসমে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি যে-বৌদ্ধিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন তাঁর মূল কোথায় নিহিত ছিল। ভারতবর্ষে সৌরসংস্কৃতির কৃষিভিত্তিক বরুণ-বিষ্ণু-কৃষ্ণের ধারায় যে-সৃষ্টিশীল মননের বিবর্তন আমরা লক্ষ করেছি তারই অন্যতম ফলশ্রুতি ছিল শক্তিজীবী ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে মধ্যযুগের ভক্তি-আন্দোলন। সামন্ততন্ত্র-পুষ্ট শূদ্রনিপীড়ক শংকরাচার্যের নেতিবাদী নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধেও ভক্তি-আন্দোলনের প্রবক্তারা সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। ফলে একমাত্র ঈশ্বরের উদ্দেশে আত্মনিবেদন তথা প্রেম-ভালোবাসা-উপাসনা ইত্যাদিকে স্বীকৃতি দিয়ে সেদিন ভারতের বুকে যে-মহাভারতের সূচনা হয়েছিল তার অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন শ্রীমন্ত শংকরদেব। শাস্ত্রীয় নির্দেশের বিরুদ্ধে দেশীয় ভাষার স্বীকৃতি তথা খোল-তাল সংগীত-নৃত্য সহযোগে যে-সাংস্কৃতিক বিশ্বের জন্ম দিয়েছিলেন তিনি তা আজও অসমকে ভারতীয় পটভূমিতে এক উচ্চাসনে আসীন করে রেখেছে। ❑

**সংকেত-সূত্র :**


১। Suniti Kumar Chatterji : The Place of Assam in the History and Civilization of India, G.U. edn. P. 52

২। K.Damodaran : Indian Thought A Critical Survey, Asia Publishing House, Kolkata, 1967, P. 315

৩। ক) "The Vaishnava school did not try to start a new philosophy, but based its teachings on Naradiya Pancharatra and the Bhagavata and laid stress on a life of purity, high morality, worship and devotion to only one God who is above all the Creator, Preserver and Destroyer."

P. 3

খ) "Vaishnavism continued to be in general a noble and sweet influence on life." Nilakanta Shastri : A History of South India, P. 433

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৮ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৪৪ পৃ. ৪৪৪

৫। মীমাংসকগণ ইন্দ্র আদি দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেও তাঁদের মতে যজ্ঞের অনুষ্ঠানই ছিল প্রধান লক্ষ্য, দেবতা বা ঈশ্বর ছিলেন এখানে গৌণ— "দেবতা বা প্রয়োজয়েৎ অতিথিবৎ ভোজনস্য তদর্থত্বাৎ"— মীমাংসা-দর্শন- ৯।১।৬

৬। ক) "We see clearly that there is no basis for any conception of the unreality of the world in the hymns of the Rig-Veda. The world is not purposeless phantasm, but is just evolution of God." S. Radhakrishnan : Indian Philosophy, Vol.I, P. 103-04

খ) "There is hardly any suggestion in the Upanishads that the entire universe of changes, is a baseless fabric of fancy, a mere phenomenal show, or a world of shadows." Ibid, P. 186

গ) "The doctrine of Maya or illusion, propounded by Sankara and later emphasized in various directions. ... But this is not Indian philosophy as it can be gained from the Vedas and the Upanishads." V.K.Gokak: India and World Culture, P. 108

৭। শংকরাচার্য ঈশ্বরকেও মায়িক সৃষ্টি বলে ঘোষণা করে বলেছিলেন, "এতাবুপাধী পরজীবয়োস্তয়ো সম্যঙ্‌নিবাসে ন পরো ন জীবঃ" (বিবেকচূড়ামণি- ২৪৪) অর্থাৎ, 'মায়া হল জীব এবং ঈশ্বরের উপাধি; এই মায়া দূরীভূত হলে ঈশ্বর বা জীবের পৃথক অস্তিত্ব আর অনুভূত হয় না (একমাত্র নির্বিশেষ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন)।'

৮। ৩।২।১১ সংখ্যক ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে শংকরাচার্য লিখেছেন, "সমস্তবিশেষ রহিতং নির্বিকল্পমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং ন তদ্বিপরীতম্" অর্থাৎ, 'সর্বপ্রকার বিশেষত্বহীন নির্বিকল্প ব্রহ্মই একমাত্র প্রতিপাদ্য, সবিশেষ ব্রহ্ম কখনোই প্রতিপাদ্য হতে পারেন না।'

৯। ক) "... Mayavada, illusionism and otherworldliness are negative doctrines which distort the new age of India." K.M. Munshi : Bhagavat Gita and Modern Life, P. 33

খ) "In India the philosophy of world-negation has been given formulations of supreme power and value by two of the greatest of her thinkers, Buddha and Shankara." Sri Aurobindo : The Life Divine, Sri Aurobindo Birth Centenary Library, Vol.18, 1972, Pondicherry, P. 415

১০। R.D. Ranade : Indian Mysticism, Pune, 1933, P.2

১১। K. Damodaran : Indian Thought A Critical Survey, P. 315

১২। শিবনারায়ণ রায় : "জাতিবাদ মনুষ্যত্ব ও সংস্কৃতি," 'গণতন্ত্র সংস্কৃতি ও অবক্ষয়,' ১ম সং ১৯৮১, পৃ. ৯৭

১৩। Bertrand Russell : Marriage and Morals, 1st edn.1929, London, P. 21-22

১৪। Jawaharal Nehru : 'The Discovery of India', P. 85

অনুরূপ মন্তব্য অনেকেই করেছেন,

ক) "The Rigveda attached great importance to agriculture (krishi)..." Radhakumud Mukherjee : 'Hindu Civilization', Part I, P. 75

খ) "The word 'Aryan' implies one acquinted with the processes of agriculture, a rearer of the ground, to use an Elizabethan word– accustomed, therefore, to a fixed and industrialized

mode of living, evidently in contrast to others who were not." Sister Nivedita : 'The Web of Indian Life', P. 140

অবশ্য অনেকে 'ঋ' ধাতুজাত 'আর্য' শব্দটির অর্থ করেছেন 'যাযাবর'। কেননা বিভিন্ন গণে যে 'ঋ' ধাতু দেখা যায় তার অধিকাংশের অর্থই হচ্ছে গতি। ধর্মানন্দ কোসম্বী ; 'ভগবান বুদ্ধ', (বাংলা অনুবাদ শ্রী চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য) ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৬, পৃ.৪

১৫। Gordon Childe : 'What Happend in History,' P. 274

১৬। "Indo-European languages evolving among the earliest agriculturalists." -Stuart Pigott.: 'Prehistoric India,' P. 274

১৭। অমলেশ ভট্টাচার্য : 'বেদমন্ত্র মঞ্জরী', পৃ. ১১

১৮। ড. যোগীরাজ বসু : 'বেদের পরিচয়', ১ম সং, ১৯৭৫, পৃ. ২৬১

১৯। D.H. Lawrence : 'Movements in European History', P. 54

২০। Buddha Prakash : 'Political and Social Movements in Ancient Punjab', P. 32

২১। Dr. Jyotiprasad Jain: 'Jainism : The Oldest Living Religion', P. 43

২২। S. Abid Hussain : 'The National Culture of India', P. 16

২৩। শ্রী চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য অনূদিত ধর্মানন্দ কোসম্বীর 'ভগবান বুদ্ধ' গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃ. ৬-৭

'ইন্দ্র' শব্দের ব্যুৎপত্তিও লক্ষ করার মতো : "'ইন্' ও 'দ্র' এই দুই শব্দের সংযোগে 'ইন্দ্র' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ইন্' মানে যোদ্ধা। উদাহরণ স্বরূপ, 'সহ ইনা বর্ততে ইতি সেনা' অর্থাৎ যোদ্ধার সহিত যে থাকে, তাহাকে সেনা বলে। ব্যাবিলনীয় ভাষায় শিখর অথবা মুখ্য অর্থে 'দ্র' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। সুতরাং ইন্দ্র মানে সেনার অধিপতি অথবা সেনাপতি। দেখিতে দেখিতে, এই শব্দটি রাজার বাচক হইয়া গেল।" *তদেব*, পৃ. ৫

২৪। ঋগ্‌বেদ ৮।৯৮।১৩-১৫

২৫। ক্ষিতিমোহন সেন : 'ভারতের সংস্কৃতি', পৃ. ৪৫

২৬। A.L.Basham : 'The Wonder That was India', P. 301

২৭। R.N. Dandekar : 'Exercise in Indology', P. 88

২৮। "The Brahmana-period does show the social and intellectual domination of the priestly class over the other classes of society." Ibid, P. 89

২৯। "The conservative Brahmins persisted in a way of life formed when cultivation was relatively unimportant to food supply." D.D. Kosambi : 'An Introduction to the Study of Indian History.' P. 170

৩০। "The Brahmins showed no interest in the higher development of the religion of the people. They were not preoccupied with ethics." Albert Schweitzer : 'Indian Thought and Its Development', P. 28

৩১। D.D. Kosambi : 'An Introduction to the Study of Indian History', P. 172

৩২। "The theological content of Brahmanical education, although admirably suited to Brahmanical purposes, had a restrictive effect on the intellectual tradition. ... The denigration of technical knowledge is an instance of the split in the educational tradition of this period, which was

almost as a Sub-section ... of astrology." Romila Thapar : 'A History of India', P. 254-255

৩৩। ধর্মানন্দ কোসম্বী : 'ভগবান বুদ্ধ', পৃ. ৬২

৩৪। "The Brahmanic world-view is focussed on world and life negation, because it goes back to the magical mysticism of union with the Supra-sensuous by withdrawal from the world." Albert Schweitzer: 'Indian Thought and Its Development', P. 31

৩৫। D.D. Kosambi : 'The Culture and Civilization of Ancient India', P. 205

৩৬। D.D. Kosambi : 'An Introduction to the Study of Indian History', P. 260

৩৭। A. L. Basam : 'The Wonder That was India', P. 303

৩৮। ড. নির্মলপ্রভা বরদলৈ : সূর্য, ২য় প্রকাশ ২০০৮, গুয়াহাটি, পৃ. ১০৫

৩৯। *তদেব*, পৃ. ১০৭

৪০। গোলকেশ্বর বরুয়া; ড. নির্মলপ্রভা বরদলৈ কর্তৃক তাঁর সূর্য গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১০৭-০৮

৪১। *তদেব*, পৃ.১০৯

৪২। Lakshminath Bezbaroa : The Religion of Love and Devotion, Asom Sahitya Sabha, 1968, P. 3-4

৪৩। শংকরাচার্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি "...laid down the dictum that only those who were high-born could realize the non-difference of the atman and Brahman. Needless to say, the study of the Vedas and the Upanishads remained exclusively the privilege of the 'high-born' upper classes, the enlightened few under feudalism." - K. Damodaran : 'Indian Thought A Critical Survey', P. 259

৪৪। Suniti Kumar Chatterji : 'The Place of Assam in the History and Civilization of India', P. 53

৪৫। *Ibid*, P. 53

৪৬। তীর্থনাথ শর্মা : 'পঞ্চপুষ্প', পৃ. ৮০

৪৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'শান্তিনিকেতন', ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ. ১২

৪৮। গৌরী ধর্মপাল : 'বেদ ও শ্রীঅরবিন্দ', ১ম মুদ্রণ, ১৯৮১, পৃ. ৪৬

৪৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'শান্তিনিকেতন', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪

৫০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', ২৪শ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৭৭, পৃ. ৩১৯

৫১। নলিনীকান্ত গুপ্ত : 'নলিনীকান্ত গুপ্ত রচনাবলী', ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৬

৫২। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে।
তততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতা।। (ঈশো-৯)

৫৩। 'বিবেকচূড়ামণি', পৃ. ২৮৭

৫৪। 'শ্রীঅরবিন্দ : ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি' (বাংলা অনুবাদ : সুরেন্দ্রনাথ বসু), পণ্ডিচেরি ১৯৬৯, পৃ. ২০৫